দৈনিক সংবাদ 064

তারিখ 05 JAN 1986
পৃষ্ঠা ... 9 কলাম 1

সংবাদ

ঢাকা : রোববার, ২০শে পৌষ, ১৩৯২

প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ

দেশের তিন-চতুর্থাংশ লোকই নিরক্ষর। একথা বিবেচনা করে বছরের শুরুতেই অর্থাৎ '৮৬-র ১লা জানুয়ারী থেকে ১৪ই জানুয়ারী পর্যন্ত দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ পালিত হচ্ছে। উদ্দেশ্য, প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলা এবং এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ পালনের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে একটি ভাল পদক্ষেপ। কিন্তু এ ধরনের উদ্যোগ এ দেশে নতুন নয়। অতীতে এইসব উদ্যোগ থেকে ফল পাওয়া গেছে সামান্যই। বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবী ছিল পাকিস্তান আমল থেকেই। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা ও দু'বছর মেয়াদী পরিকল্পনায়ও এই লক্ষ্য অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলা হয়েছিল। পরবর্তী পর্যায়ে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর ধারণা থেকে পেছনে সরে এসে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর ধারণা গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় গৃহীত এই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীও বাস্তবায়িত হয়নি। পরিকল্পনা কমিশনের দলিলে তা সরকারীভাবেই স্বীকার করা হয়েছে। এই দলিলের বরাত দিয়ে সম্প্রতি সংবাদ-এ প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রান্তিক বছরে যেখানে ১ কোটি ৩০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল সেখানে '৮৫ সালে দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাথমিক শাখাসহ) প্রকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৮৯ লাখ ২০ হাজার। পাঁচ বছরে ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৮ লাখ। বাস্তবে বেড়েছে ৭ লাখ। এই হিসেবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে মাত্র শতকরা ১৫ ভাগের মত। এ সময়ে ২ হাজার বিদ্যালয়কে সরকারীকরণের কথা ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সরকারীকরণ করা হয়েছে মাত্র ১১০টি বিদ্যালয়--অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৫ ভাগ। শিক্ষক প্রশিক্ষণের কথা ছিল ১ লাখ ৬১ হাজার। বাস্তবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে মাত্র ৩২ হাজার শিক্ষককে। একইভাবে বিদ্যালয় ভবন ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ এবং নলকূপ স্থাপনের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল তার কোনটাই অর্জিত হয়নি।

লক্ষ্যমাত্রা কেন অর্জিত হয়নি তার কারণ কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। সরকারীভাবেই স্বীকার করা হয়েছে অর্থাভাব লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ ছিল। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ ছিল ৩শ' ৩১ কোটি টাকা। পরিকল্পনাকালে প্রকৃত বরাদ্দ এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে ধার্য করা হয় ২শ' ২৯ কোটি টাকা। তারও সবটা ব্যয় করা হয়নি। পুরো অর্থ বরাদ্দ করেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অর্জন সম্ভব নয় সেখানে বরাদ্দ এক-তৃতীয়াংশ কমিয়ে দিলে তা আর বাস্তবায়িত হবে কি করে?

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা অর্জনে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে কোন সামঞ্জস্য নেই। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিদ্যালয় গমনোপযোগী বয়সী ছেলে-মেয়েদের শতকরা ৭০ ভাগকে স্কুলে পড়াবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং কর্মসংস্থান সম্প্রসারণের পরই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। অথচ অর্থ বরাদ্দে এর স্থান ষষ্ঠ। ৩৮ হাজার ৬শ' কোটি টাকার পাঁচসালা পরিকল্পনায় শিক্ষা ও ধর্মীয় বিষয়ে বরাদ্দ করা হয়েছে মাত্র ১ হাজার ৩শ' ৭০ কোটি টাকা, এর মধ্যে একটা বড় অংশ চলে যাবে মাধ্যমিক, উচ্চ ও ধর্মীয় শিক্ষাখাতে।

দেশে উচ্চশিক্ষার হার যথেষ্ট একথা কেউ বলবেন না। উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধা অবশ্যই আরও বাড়াতে হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার উপরও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া উচিত। দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো সারাদেশের সবগুলো সাবেক জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সোচ্চার দাবী উঠলেও প্রাথমিক শিক্ষার হার বৃদ্ধির ব্যাপারে জোরালো জাতীয় দাবী নেই। এ ব্যাপারে আগে রাজনৈতিক দলগুলো হতে যে দাবী করা হতো তাও এখন স্তিমিত। আমরা অবকাঠামোর চেয়ে উপরিকাঠামো নির্মাণেই যেন বেশী নজর দিয়ে থাকি। অথচ সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার অভাবে ধনী-দরিদ্র এবং গ্রাম-শহরের বৈষম্য বাড়ছে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অসম্ভব হয়ে পড়েছে বলে সরকারী পর্যালোচনায়ই স্বীকার করা হয়েছে।

গরীব দেশে তহবিলের সংস্থান করা কঠিন বটে। কিন্তু এজন্যই অগ্রাধিকার নির্ধারণে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। অনুৎপাদক খাতে ব্যয়বাহুল্য কমিয়ে শিক্ষাখাতে অধিকতর অর্থ বরাদ্দের অবকাশ আগেও ছিল এবং এখনও রয়েছে।

অর্থাভাবই যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থতার একমাত্র কারণ তা নয়। যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তারও সদ্ব্যবহার হয়নি। শিক্ষা বছরের প্রায় অর্ধেক পার হয়ে যাবার পর পাঠ্য পুস্তক প্রকাশ বা সরবরাহ অমার্জনীয় গাফিলতির একটি নজির। সরকারী মনিটরিং বিভাগের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অবকাঠামো নির্মাণ না করা, শিক্ষক স্বল্পতা, কর্মসূচী বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, যথাসময়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ ও সরবরাহ না করা এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার জন্য দায়ী।

প্রাথমিক শিক্ষকের স্বল্পতা আছে বটে। কিন্তু যে শিক্ষক আছেন তারা কতটুকু শিক্ষা দিচ্ছেন এ প্রশ্নও এখানে আসে। এক সময় প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন কি রকম ছিল তা সৈয়দ মুজতবা আলীর পণ্ডিত মশাই গল্পে তীর্যকভাবে ফুটে উঠেছে। তখন যার কোন গতি ছিল না তারাই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতে যেতেন। এখন প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন সঙ্গত কারণে মোটামুটি বাড়ানো হলেও সে তুলনায় যোগ্য লোকজন ওই পেশায় আকৃষ্ট করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। যেসব শিক্ষক আছেন তাদের কাছ থেকে ঠিকমত কাজ আদায় করে নেয়ার ব্যবস্থাও অত্যন্ত দুর্বল। এজন্য স্থানীয় তদারকি ও সরকারী পরিদর্শন ব্যবস্থা জোরদার করা একান্ত প্রয়োজন।

দেশে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনে সবচেয়ে যে বড় বাধা তা হচ্ছে আমাদের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা। শিক্ষার স্বল্পতম ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্যও অধিকাংশ মানুষের নেই। বরং স্কুলবয়সী ছেলে-মেয়েদের তারা স্কুলে পাঠানোর চেয়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে সংসারের সাহায্যকারী হিসেবে গণ্য করে। যারাও বা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তাদেরও অধিকাংশই কিছুদিন পরে লেখাপড়া ছেড়ে রোজগারী সদস্য হিসেবে সংসারের হাল ধরায় সাহায্য করে। কাজেই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হলে সাধারণ মানুষের ভাগোন্নয়নেও প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষাকে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কেরালায় ছাত্রদের দুপুরের খাবার বিদ্যালয়ে সরকারের খরচে সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একে ব্যয় মনে না করে দেশের উন্নয়নে বিনিয়োগ হিসেবে আমাদেরকেও এ ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

কর্তৃপক্ষের মনে রাখা উচিত জনগণকে অন্ততপক্ষে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে পরিবার পরিকল্পনার মত কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়িত হবে না, জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিগণিত হবে না। বিষয়টাকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া উচিত। নইলে কেবল প্রাথমিক শিক্ষা পক্ষ পালন করে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না। বছর বছর বৃক্ষরোপণ পক্ষ পালনের মতই এর ফল লাভ হবে সামান্যই।